শেখ ইতিসামুদ্দীনের ইংলণ্ড সফর

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্

জীবনকথা*

শেখ ইতিসামুদ্দীন নদীয়া জেলার (ভারত) পাঁচনুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম-তারিখ অজ্ঞাত। তাঁর পিতা ও পিতামহ ছিলেন যথাক্রমে তাজুদ্দীন ও শিহাবুদ্দীন তালিশ। তালিশ ছিলেন প্রখ্যাত ফার্সীগ্রন্থ 'তারীখ-ই-আসাম'-এর লেখক। তিনি মীর জুমলার (১৬৬০-১৬৬৩) সেনা-বাহিনীর সাথে ইরান থেকে ভারতে এসেছিলেন।

ইতিসামুদ্দীন প্রথমে বাংলার নওয়াব মীর জা'ফর আলী খানের (১৭৫৭-৬০; ১৭৬৩-৬৫) অধীনে সেরেস্তাদার ছিলেন। এ সময় তিনি নওয়াবের অন্যতম মুন্শী সলীমুল্লাহ ও মীর-মুনশী মির্যা কাসেমের সাহচর্যে কিছুটা পড়াশোনা করেন। অতঃপর তিনি নওয়াব মীর কাসেমের (১৭৬০-১৭৬৪) আমলে মেজর পার্কের অধীনে চাকরি নেন। ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে মেজর পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বীরভূমের রাজা আসাদ যামানের সংগে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধের পর তিনি মনিবের সাথে আযীমা-বাদ গিয়ে শাহ আলম বাদশার (১৭৫৯-১৮০৬) সাক্ষাৎ লাভের সম্মান অর্জন করেন। অতঃপর ঐ মেজর সাহেবের সঙ্গে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। সে সময় কলকাতায় কোম্পানির মুনশীখানায় (সেক্রেটারিয়েট) ইংরেজ সাহেব-দের অধীনে সাতজন লোক মুনশী-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন: মুনশী আসাদুল্লাহ, মুনশী তাজুদ্দীনের পুত্র মুনশী ফখ্রুদ্দীন, মুনশী মুহম্মদ উসলূব, মুনশী আবদুল বারী, মেজর কর্নাকের অধীনস্থ মুনশী মুয়েয,

---

* শেখ ইতিসামুদ্দীনের জীবনকথা, ইংলন্ড সফর ও সফরনামা রচনায় যাবতীয় তথ্য তাঁর 'শিগ্রফ্নামা-ই-বিলায়ত' (ফার্সী) গ্রন্থের ভূমিকা থেকে গৃহীত।

কর্নেল কুট বাহাদুরের অধীনস্থ মীর সদ্রুদ্দীন ও মুনশী সলীমুল্লাহ, যিনি কলকাতায় হেনরী ভ্যান্সিটার্টের অধীনে কর্মচারিরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

পার্ক সাহেব যখন ইংলন্ড চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ইতিসামুদ্দীনকে একটি সুপারিশ-পত্র এবং বীরভূম ও আযীমাবাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলের একটি মানচিত্রসহ মেজর আদামের নিকট চাকরির উদ্দেশ্যে পাঠান। কিন্তু তদানীন্তন 'রাজা' উপাধি ধারণকারী বেণীকিষণের প্রতারণায় তিনি চাকরি পেলেন না। অবশেষে তিনি মি. স্ট্রাচীর অধীনে ক্যাপ্টেন ম্যাকিননের তত্ত্বাবধানে জলেশ্বর চাকলার লংগরখানায় বখশী নিযুক্ত হন। এখানে ইতিসামের দু'বছর কাটে। অতঃপর গিরিয়া ও আওয়দ্নালায় মীর কাসেম আলী খানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই ইংরেজী বাহিনীর সংগেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তারপর নিজ সাহেবের সঙ্গে তিনি রাজমহল থেকে এসে মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। মি. বার্ডেটের আমলে তিনি এক বছরকাল কুতুবপুর পরগণায় তহসিলদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

স্ট্রাচী সাহেবের মৃত্যুর পর বকসারের যুদ্ধে যখন বাংলার নওয়াব মীর কাসেম ও অযোধ্যার নওয়াব সুজাউদদৌলাহ্ মেজর মনরোর হাতে পরাজিত হয়ে (১৭৬৫) লখনৌ থেকে রোহিলখণ্ডের দিকে পলায়ন করেন, তখন ১১৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে ইতিসামুদ্দীন মেজর কর্নাকের অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। মেজর কর্নাকের সাথে জাঁহাগড়ে বাদশা শাহ্ আলমের যে সাক্ষাৎ ঘটে, সেখানে ইতিসামুদ্দীনও উপস্থিত ছিলেন। তারপর ইতিসামুদ্দীন এলাহাবাদ গিয়ে সেখান থেকে লখনৌ পৌঁছান। ইতিমধ্যে (১৭৬৫) বিলাতের ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকে পুনরায় গভর্ণর নিযুক্ত করে বাংলাদেশে পাঠান। এলাহাবাদে নওয়াব সুজাউদদৌলাহ ও বাদশা শাহ আলমের সাথে লর্ড ক্লাইভের এক সন্ধি হয়, যার সূত্র ধরে ইতিসামুদ্দীন বিলাত গমন করেন (১৭৬৭)। এ সন্ধি অনুযায়ী ক্লাইভ চব্বিশ লক্ষ টাকা করে এলাহাবাদ ও কোরা জাহানাবাদ—এ দুটি জেলার জন্য মোট ৪৮ লক্ষ টাকা আয় ধার্য করেন এবং তা বাদশা আলমকে তাঁর কর্মচারীদের ব্যয়-ভার নির্বাহের জন্য ছেড়ে দিলেন। বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যা প্রদেশ এবং ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বেনারস ও আরীপুর নওয়াব সুজাদউদ্দৌলাহ্কে প্রদান করা হলো। বকসার

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ক্লাইভ নওয়াব সুজাউদ্‌দৌলার নিকট থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করলেন। ক্লাইভ সম্রাট শাহ আলমকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করে তাঁর নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রতিরক্ষা ও দেওয়ানী অর্থাৎ খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিলেন। প্রতি বছর ৬০ লক্ষ টাকা আদায় করবেন—এই শর্তে বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হলো মীর জা'ফরের পুত্র নাজমুদ্দৌলাহ্‌-কে। এ সন্ধিপত্র রচনার সময় মুনশী মুহম্মদ মুয়েয ও ইতিসামুদ্দীন উপস্থিতি ছিলেন। তাঁরা ইংরেজ প্রশাসক ভিন্সিটার্টের অনুমোদন নিয়েই এ চুক্তিপত্র সম্পন্ন করেন।

এলাহাবাদের সন্ধিপত্র রচনার সময় শাহ আলম বাদশা নিজ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করার জন্য ক্লাইভের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সুবার দেওয়ানী ও প্রতিরক্ষা এবং জা'ফর আলী খানের পুত্র নাজমুদ্‌দৌলার নামে বিচার ও নিয়ামতের সনদ লিখিয়ে লর্ড ক্লাইভ এলাহাবাদ থেকে প্রস্থান করতে চাইলেন। এমনি সময় সম্রাট তাঁকে বল্লেন "কম্পানির কাজ আপনি মনেচ্ছামত করলেন, কিন্তু আমার কোন কাজই বস্তুত আপনি করেন নি। দিল্লীর সিংহাসনে আমার সমাসীন থাকা এবং অধীনস্থ অঞ্চল গুলো করায়ত্ত রাখার জন্য একটি ইংরেজ বাহিনীর নিয়োগ তো আপনি আদৌ করলেন না। আপনি তো আমাকে রাজদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতদের মধ্যে রেখে চলে যাচ্ছেন।" বাদশার এ আবেদনে জেনারেল কর্নাক ও লর্ড ক্লাইভ বিচলিত হলেন। লর্ড ক্লাইভ প্রত্যুত্তরে বল্লেন: "ইংলণ্ডের রাজা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির নির্দেশ ছাড়া আপনার জন্য গোরা সৈন্য সরবরাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপাতত এতটুকু করা যেতে পারে যে, আপনি (শাহ আলম) এখন এলাহাবাদেই থেকে যান, জেনারেল স্মীথ এক পল্টন সৈন্য নিয়ে আপনার কাছে থাকবেন। এ ছাড়া অদূরবর্তী জৌনপুরে ইংরেজ সৈন্যের ছাউনি রয়েছে; প্রয়োজন মত তারা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে।" তখন ঠিক করা হলো যে, বাদশার অনুরোধপত্রসহ তাঁর তরফ থেকে এক লক্ষ টাকার উপঢৌকন নিয়ে একজন দূত যাবে ইংলন্ডে। ঢাকার প্রথম ইংরেজ প্রশাসক ক্যাপ্টেন সুইন্টন দূত মনোনীত হন এবং বাদশার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর সহযোগিতা করার জন্য ফার্সীবিদ মুনশী ইতিসামুদ্দীন নির্বাচিত হন। নওয়াব মুনীরুদ্‌দৌলার পক্ষ

থেকে যাতায়াত-খরচ স্বরূপ ইতিসামুদ্দীনকে চার হাজার টাকা দেয়া হলো এবং প্রত্যাবর্তনের পর আরো রাজকীয় পুরস্কার ও অনুগ্রহ প্রদানের ওয়াদাও করা হলো। এদিকে শাহী ফরমানটি (অনুরোধ-পত্র) নিয়ে লর্ড ক্লাইভ একটি চক্রান্ত করলেন। বাংলাদেশ দখল এবং এর প্রশাসনিক ব্যাপারে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করে, দ্বিতীয়ত শাহ আলমের পত্রটি বিলাতের রাজকীয় স্বার্থের পক্ষে এবং কোম্পানি-স্বার্থের বিপক্ষে যাবে মনে করে সুচতুর ক্লাইভ বাদশার মূল পত্রটি গোপন করে ফেলেন এবং কলকাতার অন্যান্য কাউন্সিল-সদস্যদের অগোচরে সেখানকার দমদম বাগানে জেনারেল কর্নাক, ক্যাপেটন স্থইন্টন, জর্জ ভ্যান্সিটার্ট, নওয়াব আমীরুদ্দৌলাহ্ ও রাজা শিতাব রায়ের সহযোগিতায় একটি নতুন চিঠি প্রস্তুত করেন। বাদশার আমলাবর্গ মনে করতেন : কোম্পানির কাজ হল শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করা ; দেশ শাসনে তাঁদের কোন অধিকার নেই। তাঁরা আরো ভাবতেন : মুসলমান মুজাহিদগণ জিহাদ করেই এ দেশ জয় করেছিলেন, তাই ইংরেজ কোম্পানির এখানে নাক গলাবার কিছুই নেই। বৃটিশ রাজকীয় শক্তিরও এদেশ দখল করার ইচ্ছা প্রথমত ছিল না। কিন্তু ক্লাইভ ছিলেন কোম্পানির খয়ের খাঁ ; তাঁর অভিলাষ ছিল—এ দেশকে করায়ত্ব করা। শাহ আলমের পত্রটি কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থী হবে একথা ভেবে তিনি শাহীপত্র গোপন করেই ক্ষান্ত হননি, কলকাতার দমদম-বাগানে তিনি একটি কৃত্রিম পত্রও রচনা করেন, তাও আবার নির্ধারিত পত্রবাহক স্থইণ্টনের হাতে দিলেন না। তিনি স্থইনণ্টন-কে বল্লেন : "বেনারস থেকে বাদশার উপঢৌকন এসে পৌঁছায়নি, জাহাজ ছাড়ারও সময় আগত ; তাই আপনি ইতিসামুদ্দীন-কে নিয়ে যাত্রা করুন ; আগামী বছর আমি শাহী-ফরমান ও তাঁর উপঢৌকন নিয়ে আসছি।"

ইংলণ্ড সফর

ক্লাইভের নির্দেশানুসারে স্থইণ্টন ও ইতিসামুদ্দীন ১১৮০ হিজরীর ৯ই শা'বান মোতাবেক ১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতার হিজলী ঘাটে মশীয়ে সোরভিল নামক জাহাজে চড়ে ইংলন্ডে যাত্রা করেন। সমুদ্র যাত্রাকালে ইতিসামুদ্দীন ক্লাইভের চিঠিসংক্রান্ত চক্রান্তের কথা জানতেন না। সাত দিন সমুদ্র পথ অতিক্রম করার পর তিনি সুইণ্টনের মুখে

এই ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনার কথা জানতে পারলেন। কিন্তু তখন তাঁর পক্ষে কিছুই করার ছিল না। মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে রইলেন। ছয় মাস পর তাঁরা ইংলন্ড পৌছেন। সেখানে পৌঁছেও ইতিসামুদ্দীন মনের ক্ষোভে বিদগ্ধ ছিলেন। ক্যাপেটন সুইন্টন তাঁকে শাহীপত্রের রহস্য ফাঁস করতে নিষেধ করেছিলেন। তাই মনোবেদনায় দগ্ধ হওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। তিনি শুধু বিলাতের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখতেন। কিন্তু সেগুলো উপভোগ করার মত মন তাঁর ছিল না। দুঃখ নিবারণের জন্য তিনি ইতিহাসের বই পড়ে দিন কাটাতেন। অন্য দিকে লর্ড ক্লাইভের আগমনের প্রতীক্ষা করতেন।

দেড় বছর পর লর্ড ক্লাইভ বাদশার উপঢৌকন নিয়ে বিলাতে উপস্থিত হলেন এবং বাদশা-প্রদত্ত উপহার ইংলন্ডের রাণীকে দিলেন। কিন্তু তা নিজের নামেই চালিয়ে দিয়ে বাহবা কুড়ালেন। এমনি প্রতারণা করে তিনি ইংলন্ডের রাজার প্রিয় ভাজন হলেন। তিনি রাজার কাছে বাদশা শাহ আলমের চিঠির কথা একবারও উচ্চারণ করেন নি। ক্যাপ্টিন সুইন্টনও বন্ধুত্ব ও জাতিত্ব-বোধের টানে ক্লাইভের এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন নি। শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর পর ইতিসামুদ্দীন কলকাতার কাউন্সিলের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী মি. মাজিন্দীর সাথে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ১১৭৯ সনের কার্তিক মাস মোতাবেক ১৭৭০ খ্রী. ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি ক্লাইভের চক্রান্তের বিস্তারিত বিবরণ জেনে ফেলেন। কিন্তু শাসক-শক্তির ভয়ে তিনি সব কথা বেমালুম হজম করে গেলেন। উপমহাদেশীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বিলাত ভ্রমণ করেন।

দেশে ফিরে ১১৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইতিসামুদ্দীন পুন-রায় ইংরেজ সরকারের চাকরি করেন। চাকরির ব্যপদেশে তাঁকে কর্নেল জন হ্যামিল্টনের সাথে পুনা-সাতারায় যেতে হয়েছিল। কর্নেল হ্যামিল্টন মারাঠা সরদারদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কর্নেল সাহেবের পক্ষ থেকে মারাঠা সরদারের সাথে সওয়াল-জওয়াব করা, পেশওয়ার দরবারের প্রধান-পণ্ডিত নরদ সখারাম বাবু এবং বালাজী রাও ওরফে নানার নিকট আসা-যাওয়া করা ও চুক্তি সম্পাদন করা—সবকিছুই ভ্যান্সিটার্টের পরামর্শে ইতিসামুদ্দীনকেই করতে হয়েছিল। অল্প কথায়, তাঁর পুরো জীবন ইংরেজ কোম্পানির সাহেবদের চাকরিতেই অতিবাহিত হয়।

সফরনামা রচনা

চাকরি-শেষে ভগ্নদশা অবস্থায় ১১৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে ইতিসামুদ্দীন তাঁর বিলাত সফরের বৃত্তান্ত একটি গ্রন্থাকারে লিখতে মনস্থ করেন। 'শিগ্রফ নামা-ই-বিলায়ত' (বিলাতের সৌন্দর্য-গ্রন্থ) হলো এরই ফলশ্রুতি। ইংলন্ডে তাঁর অবস্থানকাল ছিল এক বছর। এই এক বছর সময়ে তিনি লন্ডন ও এডিনবরা শহরে বাস করে তথাকার শহুরে মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা, যানবাহন সৌধরাজি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করেন। ক্যাপ্টেন সুইন্টনের বাস্তুভিটা ছিল এডিনবরায়। তিনি সুইণ্টনের সঙ্গে সেখানে যান। তিনি লন্ডনের চিড়িয়াখানা, মানমন্দির, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পরিদর্শন করেন এবং ইংরেজ জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি দেখে বিস্মিত হন। ভারতবাসীদের তুলনায় ইংরেজগণ যে উন্নত ও সভ্য, এ ব্যাপারটি তিনি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুভব করেছিলেন। তিনি তুলনামূলক বিষয়াদির প্রসঙ্গে ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগতির কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। তাঁর মনে দেশাত্মবোধ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার প্রেরণা ছিল না। তিনি সর্বত্র শাহ আলম বাদশার নাম শ্রদ্ধাসহকারে উচ্চারণ করেন। তিনি সারাটি জীবন ইংরেজ সরকারের অধীনে কাটান। জীবিকার জন্য তাঁকে মুসলিম জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধেও কাজ করতে হয়েছিল।

ইতিসামুদ্দীন একজন ভাল সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর 'শিগ্রফ্ নামা-ই-বিলায়ত' পাঠ করে বাংলার সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। সমসাময়িক ইতিহাসরূপে এ-গ্রন্থটিকে নির্ভরযোগ্য বলা চলে। ১১৪ পৃষ্ঠা সংবলিত এ ফার্সী গ্রন্থটি এখনো প্রকাশ লাভ করেনি বলে মনে হয়। এর একটি ফটোকপি ঢাকার বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত রয়েছে। জেম্স্ এড্ওয়ার্ড আলেকজান্ডার এ-গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করে ১৮২৭ খ্রী. লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। 'শিগ্রফনামা'-র ভাষা বাক্যালংকার-বহুল। মির্যা আবু তালিব রচিত 'মাসীর-ই-তালিবী'র তুলনায় এ গ্রন্থটির সাহিত্য-মূল্য অনেক বেশী। তা-ছাড়া এ গ্রন্থটির যে রাজনৈতিক দিক রয়েছে, তা মির্যা আবু তালিবের গ্রন্থে অনুপস্থিত, ইতিসামুদ্দীনের অন্যান্য রচনা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। তিনি 'শিগ্রফ্ নামা-ই-বিলায়ত' রচনা করেন ১৭৮৪ সালে।

এতে তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বিশ্লেষণমুখী চিন্তার যথেষ্ট ছাপ রয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ, তাঁদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ও সংস্কৃতির অগ্রগতির ব্যাখ্যায় তিনি গভীর জ্ঞান ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। ইংলন্ডের বিভিন্ন বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি স্বদেশ এবং স্বজাতির গলদ ও অযোগ্যতার লক্ষণসমূহ তুলে ধরেছেন। এতে তাঁর চিত্তের ব্যাকুলতা ও কণ্ঠের আর্তনাদ কম ফোটেনি। কিন্তু এদেশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চিন্তা তাঁর মনোরাজ্যে উদিত হয়নি এবং হওয়ার মত পরিবেশ বা জাতীয় জাগরণের মশালও তাঁর সামনে প্রজ্জ্বলিত ছিল না।

ইতিসামুদ্দীন ১৮০১ সালে পরলোকগমন করেন।